# শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফরের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

ড. এ কে এনামুল হক

বেইজিংয়ের সুউচ্চ অট্টালিকা চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বাক্ষরই বহন করে

ছবি : সংগৃহীত

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফর দেশের অর্থনীতির জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। গত ৩০ বছরে এই প্রথম চীনের এমন কোনো নেতা বাংলাদেশে আসছেন। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কিন্তু এ কারণে নয়। এর সঙ্গে জড়িত আমাদের অর্থনীতি। তার সফরের সঙ্গে আমাদের দেশের অর্থনীতির গতিধারার পরিবর্তন জড়িত।

চীনের অর্থনীতির গতি আশির দশক থেকেই পরিবর্তন হতে থাকে। এর সঙ্গে জড়িত চীনের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অর্থনীতি। চীনের অর্থনীতির মূলশক্তি তার জনগণ এবং তাদের শিক্ষা। পৃথিবীতে চীন এমন একটি দেশ, যার মূল জনসংখ্যার সিংহভাগ শিক্ষার আলো পেয়ে এসেছে কয়েক শতাব্দী ধরে। চীন এমন একটি দেশ, যা 'টিপ সই' ব্যবহার করেনি। তাতেই বোঝা যায় যে চীনে শিক্ষার মূল কত গভীরে।

পৃথিবীর নানা আবিষ্কারের মূলেও ছিল চীন। নদী শাসন, বারুদের ব্যবহার, জ্বালানি তেল, সিরামিক আবিষ্কারসহ নানা আবিষ্কারের মূলে আছে চীন। কাগজের কথা নাইবা বললাম। আবিষ্কার, শিক্ষা আর অর্থনীতির সমন্বয়ে চীন পৃথিবীর একসময়ের পরাক্রমশালী অর্থনীতি ছিল। উনিশ শতক পর্যন্ত পৃথিবীর বৃহত্তম দুটি দেশের প্রথম ছিল চীন আর দ্বিতীয়টি ভারত। কিন্তু তত দিনে পৃথিবীর চাকা উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল। ইউরোপীয় রেনেসাঁর পর ইউরোপ তার শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অন্ধত্ব তাদের পেছনে নিয়ে গিয়েছিল। তাই শিক্ষাঙ্গনে তারা এনে দিল স্বায়ত্তশাসন। ফলে আবিষ্কার কিংবা মতবাদ নিয়ে মতভেদ থাকলেও কোনো বিজ্ঞজনকে মৃত্যুমুখে পড়তে হয়নি। ইউরোপ তাই ক্রমে শক্তিশালী হয়। তাদের জাহাজ আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ভারত মহাসাগরে এসে পড়ে। তাদের অর্থনৈতিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়। মহাসাগরে ইউরোপীয়রা একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করে। ফলে ভারতসহ চীনও তাদের নৌপথে বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করে। এ অবস্থায় একসময় পর্তুগিজ, ফরাসি, ডাচ ও ইংরেজরা এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে।

তাদের উপনিবেশ স্থাপন আর নৌপথে একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণে চীনা রাজারাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। আসে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মোহ। জ্ঞান-বিজ্ঞান বাদ দিয়ে ভালো করে ইংরেজি বলা নিয়ে সবার মাথাব্যথা বাড়তে থাকে। এমন একসময় এসেছিল যখন চীনের রাজাও মনে করতেন যে, শিক্ষা মানেই ইংরেজি শিক্ষা। চীনের রাজধানীতে অবস্থিত রাজবাড়ি, যা 'নিষিদ্ধ নগরী' নামে পরিচিত; সেখানে ভ্রমণ করলেই এর পরিচয় পাওয়া যাবে। সেখানে দেখা যাবে রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাজার ইংরেজ শিক্ষকের বাসভবন। পৃথিবীতে ভাষার লিখিত রূপ আবিষ্কারের পরও চীনের রাজার ইংরেজি ভাষাপ্রীতি সম্ভবত চীনা জাতিকে একসময় হীনম্মন্যতায় ভুগিয়েছিল। ফলে তারা ভুলে গিয়েছিল যে তারাই সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম সভ্য মানবজাতির একটি। ফলাফল হয়েছিল চীনের জন্য ভয়াবহ। চীন খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হয়েছিল। চীনের এই ভাগ্য বদলাতেই এসেছিলেন মাও জে দং। পশ্চিমাদের উপহাস থেকে চীনা জাতিকে উদ্ধারের প্রাথমিক পদক্ষেপই ছিল ১৯৪৯ সালের চীনা বিপ্লব, যার ভিত্তি ছিল সমাজতন্ত্র। ফলে আবারো প্রগতির পথে বাধা হলো মানুষের আত্মা আর সংস্কৃতির স্বাধীনতা। আশির দশকে দেং শিয়াও পিংয়ের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল তারই পরিবর্তনের ধারা। আধুনিক চীন কেবল আর্থিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়নি, সৃষ্টি করেছে নতুন এক চীন, যার অর্থনৈতিক ক্ষমতা এখন সবার কাছে ঈর্ষণীয়। ট্রাম্পের রাজনৈতিক বক্তব্য তারই প্রমাণ দেয়। শুধু তা-ই নয়, প্রেসিডেন্ট ওবামা ক্ষমতায় আসার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের প্রথম বিদেশ সফর ছিল চীনে। কারণ অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর জন্য চীনের বিশ্বস্ততার প্রয়োজন ছিল। চীন ক্রমে আবারো পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে (চীন শব্দের আভিধানিক অর্থ) পরিণত হয়েছে।

এমন শক্তিধর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফর তাৎপর্যপূর্ণ তো বটেই। কিছুদিন আগে কলকাতায় এক সেমিনারে আলোচনার সময় যখন বললাম আগামী মাসে চীনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফরে আসছেন, তখন আমার বেশ ক'জন ভারতীয় বন্ধু অবাক হয়েছেন। এটা কি সম্ভব? চীনের প্রেসিডেন্ট কেন বাংলাদেশ সফরে আসবেন? কী আছে বাংলাদেশে? বললাম ভারত আর চীন আমাদের আমদানির প্রধান দুটি দেশ। বিশ বছর ধরে হয় চীন নয় ভারত আমদানির উৎস হিসেবে হয়েছে হয় প্রথম নচেৎ দ্বিতীয়। আমাদের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক গভীর হবেই।

তবে বিষয়টা একটু ভিন্ন। বাংলাদেশ একটি দুর্বল অবকাঠামোর দেশ। এখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিনিয়োগ। অবকাঠামো উন্নয়নে আগামী ১০ বছরে আমাদের প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন। কি সড়ক-মহাসড়ক, বিমানবন্দর, ব্রিজ-কালভার্ট, বিদ্যুৎ কিংবা সমুদ্রবন্দর, পয়োনিষ্কাশন কিংবা পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষা—সবক্ষেত্রেই আমাদের প্রয়োজন নতুন বিনিয়োগ। একসময় আমরা দরিদ্র জাতি ছিলাম। তখন আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল দুবেলা পেটপুরে ভাত খাওয়া। এখন দেশে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ লাখ পরিবার দুবেলা খেতে পায় না, বাকিরা বেরিয়ে এসেছে অতিদারিদ্র্য থেকে। সবার আর্থিক চাহিদা বাড়ছে। আমাদের এখনকার স্লোগান— বিদ্যুৎ চাই, কাজ চাই, শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই। ভাত চাই, কাপড় চাই-জাতীয় স্লোগানের যুগ শেষ। 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন একটা ঝলসানো রুটি'-জাতীয় চিন্তা আমাদের এখন দূর হয়েছে। ফলে দেশে প্রয়োজন বিনিয়োগ।

এ অবস্থায় সরকারের প্রয়োজন বিনিয়োগ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করা। বিনিয়োগকারী দেশ হিসেবে এখন চীন অন্যতম। ভারতও কম নয়। তাই আমাদের প্রয়োজন প্রতিযোগিতা বাড়ানো। বিশ্বব্যাংক কিংবা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ক্রমাগত পশ্চিমা বিশ্বের সৃষ্ট জাল বুনে যাচ্ছে, তাতে আমাদের বিনিয়োগ শ্লথগতিতে হচ্ছে। যে বিনিয়োগটি আজ প্রয়োজন, তার সিদ্ধান্ত দুই বছর পর করা হলে দেশের অর্থনীতি আরো স্থবির হয়ে পড়ে। সাহায্যদাতাদের মধ্যে কেবল জাপান ও যুক্তরাজ্য কিছুটা উদার বাংলাদেশের প্রতি। বাকিরা ব্যস্ত আমাদের রাজনীতি নিয়ে। এ অবস্থায় চীনের রাষ্ট্রপতির সফর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রফতানি বাণিজ্যে ভারত আমাদের প্রতিপক্ষ কিন্তু চীন নয়। এক পরিবার এক সন্তান নীতি এবং বর্তমান প্রজন্ম তাদের আগের প্রজন্মের তুলনায় কায়িক পরিশ্রমে কম আগ্রহী হওয়ায় চীনের হাজার হাজার শিল্প অন্য দেশে নিয়ে যাচ্ছেন চীনা উদ্যোক্তারাই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সুযোগ নিতে পারে। গার্মেন্ট, চামড়া, প্লাস্টিক, খেলনা, যন্ত্রপাতিসহ হাজারো শিল্প খাত চীন থেকে সরে যাচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও মিয়ানমার একযোগে কাজ করছে একটি নতুন বিনিয়োগ ও বাণিজ্য জোট সৃষ্টিতে। বাংলাদেশ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে—এটিই কাম্য।

প্রায়ই বলি যে, চীন আমাদের থেকে বহু দূরে আর ভারত শূন্য কিলোমিটার দূরে। দুটো দেশই আমাদের আমদানির প্রধান উৎসস্থল। আমাদের মধ্যে শুধু বিনিয়োগ নয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন দ্রুততম সময়ে। বিষয়টি নিয়ে সরকার ভাবছে বলেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে চীনের সঙ্গে আমাদের স্থল বাণিজ্যের উন্নয়নে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখতে হবে। আমাদের কাছে চীন আর ভারত দুটি বৃহৎ অর্থনীতি। তাদের যত কাছাকাছি আমরা যেতে পারব, ততই আমাদের সুযোগ প্রসারিত হবে।

**লেখক :** অর্থনীতির অধ্যাপক, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
পরিচালক, এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট